



قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعِيَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ  
 إِنْ أَتَيْكُمْ الرَّاكِبُ فَسَبِّحُوا لَهُ مَا رَزَقَهُ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّه يُغْثِي الْغُلَّةَ  
 الْكَلْبَاءَ وَيُغْثِي الرُّسُلَ وَأَنْتُمْ كَالْعِجْلِ الْكَلْبَاءِ ۝۱  
 إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَرَّمَهُ يَوْمَهُ سَاحِدًا مِنْ بَنِي  
 إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ قَامِنٌ وَأَسْتَكْبَرُوا أَنْ يَلْقَاهُ لَعْنَةُ  
 الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝۲ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا  
 سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ قَالُوا كَذِبٌ لَكُنَّا عَنْهَا  
 وَغَافِلِينَ ۝۳ أَمْ أَلْمُومُونَ ۝۴ وَمَنْ قَبْلَهُ كُتِبَ لَهُ مِنْ  
 سِوَانِهَا نِعْمٌ مِمَّا يُنذِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأُولَئِكَ الَّذِينَ  
 الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَلَاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ  
 يَخْزَنُونَ ۝۵ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ الْخَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً مِمَّا كَانُوا  
 يَعْمَلُونَ ۝۶ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ  
 كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَدَّهُ وَفَصَلَّهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ  
 اأَشَدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْضِعْنِي أَنْ أَسْأَلَ مِمَّنْكَ  
 الْإِنِّي أَخَشْتُ عِلْقَ وَعَلَىٰ وَالِدَيْهِ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ  
 وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُدِّئْتُ إِلَيْكَ وَالِدًا وَالْمُسْلِمِينَ ۝۷

(৯) বলুন, আমি তো কোন নতুন রসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সতর্ককারী বৈ নই। (১০) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং তোমরা একে অমান্য কর এবং বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশৃঙ্খল স্থাপন করে; আর তোমরা অহংকার কর, তবে তোমাদের চেয়ে অবিকচক আর কে হবে? নিশ্চয় আল্লাহ অবিকচকদেরকে পক্ষ দেখান না। (১১) আর কাফেররা মুমিনদের বলতে লাগল যে, যদি এ দ্বীন ভাল হত, তবে এরা আমাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারত না। তারা যখন এর মাধ্যমে সুপথ পায়নি, তখন শীঘ্রই বলবে, এ তো এক পুরাতন মিথ্যা। (১২) এর আগে মুসার কিতাব ছিল পঞ্চদশর্ষক ও রহমতস্বরূপ। আর এই কিতাব তার সমর্থক আরবী ভাষায়, যাতে বালেশ্বরেরকে সতর্ক করে এবং সংকল্পপরায়ণদেরকে সুসংবাদ দেয়। (১৩) নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। (১৪) তারাই জ্ঞানাতের অধিকারী। তারা ভাষায় চিরকাল থাকবে। তারা যে কর্ম করত, এটা তারই প্রতিফল। (১৫) আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছে আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সংকল্প করি। আমার সম্মানদেরকে সংকল্পপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম এবং আমি আশ্রাবহদের অন্যতম।

আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ - وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْكُمْ الرَّاكِبُ

আয়াতে বাক্যটি ব্যতিক্রম নির্দেশ করে। অর্থ এই যে, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, তা ব্যতীত আমি জানি না। এর ভিত্তিতে তফসীরবিদ যাহ্হাক এ আয়াতের যে তফসীর করেছেন, তার সারমর্ম এই যে, আমি একমাত্র ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান লাভ করতে পারি। ওহীর মাধ্যমে আমাকে যে বিষয় জানানো হয় না, তা আমার ব্যক্তিগত বিষয় হোক অথবা উম্মতের মুমিন ও কাফেরের বিষয় হোক অথবা ইহকালের বিষয় হোক কিংবা পরকালের বিষয় হোক—তা আমি জানি না। অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে আমি যা কিছু বলি, তা সবই ওহীর আলোকে বলে থাকি। কোরআন পাকে উল্লেখিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অনেক অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন। এক আয়াতে আছে رَبُّكَ مِنَ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ

জাহান্নাম, জান্নাত, হিসাব, নিকাশ, শাস্তি, প্রতিদান ইত্যাদি পারলৌকিক বিষয়ের বিবরণ তো স্বয়ং কোরআন পাকে অনেক রয়েছে। ইহকালের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর অনেক বিবরণও পরম্পরাগত সহীহ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, উল্লেখিত আয়াতের সারমর্ম এতটুকু যে, আমি অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞানে আল্লাহ তাআলার মত নই এবং জ্ঞানে স্বেচ্ছাধীনও নই; বরং ওহীর মাধ্যমে আমাকে যতটুকু বলে দেয়া হয়, আমি ততটুকুই বর্ণনা করি।

তফসীরে রুহুল মা'আনীতে এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, আমার বিশ্বাস, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় নেননি, যতদিন আল্লাহর সন্তা, গুণাবলী এবং পরকালের ও ইহকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করা হয়নি। তবে যাকে আগামীকাল কি করবে, তার পরিণাম কি হবে ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষের খুঁটিনাটি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকা কোন উৎকর্ষের বিষয় নয় এবং এগুলো না জানলেও নবুওয়তের উৎকর্ষ হ্রাস পায় না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত আদব : এ ব্যাপারে আদব এই যে, তিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন না, এরূপ বলা সঙ্গত নয়। বরং এভাবে বলা দরকার যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে অদৃশ্য বিষয়াদির অনেক জ্ঞান দান করেছিলেন যা অন্য কোন পয়গম্বরকে দেননি। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে পার্শ্বি অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে 'আমি জানি না' বলা হয়েছে—পারলৌকিক অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে নয়। কেননা, পারলৌকিক বিষয়ে তিনি খোলাখুলি বলে দিয়েছেন যে, মুমিন জান্নাতে যাবে এবং কাফের জাহান্নামে যাবে।—(কুরতুবী)

وَسَّهَدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ قَامِنٌ وَأَسْتَكْبَرُوا

أَوْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ قَالُوا كَذِبٌ لَكُنَّا عَنْهَا

এ আয়াতের এবং সূরা শোয়ারার আয়াতের অর্থ একই রকম। সারমর্ম এই যে, যেসব ইহুদী ও খ্রীষ্টান রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রেসালত ও কোরআন অমান্য করে, তারা স্বয়ং তাদের কিতাব সম্পর্কেও অজ্ঞ। কেননা, বনী ইসরাঈলের অনেক আলেম তাদের কিতাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। সে আলমগণের সাক্ষ্যও কি এই মূর্খদের জন্যে যথেষ্ট নয়? এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার

নবুওয়ত দাবীকে শাস্ত এবং কোরআনকে আমার রচনা বল। এর এক জওয়াব পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ বাস্তবে নবী না হয়ে নিজেই নবী বলে মিথ্যা দাবী করলে তার দুনিয়াতেই নিপাত হয়ে যাওয়া জরুরী, যাতে জনসাধারণ প্রতারিত না হয়। এ জওয়াবই যথেষ্ট, কিন্তু তোমরা যদি না মান তবে এ সম্ভাবনার প্রতিও লক্ষ্য কর যে, আমার দাবী যদি সত্য হয় এবং কোরআন আল্লাহর কিতাব হয় আর তোমরা একে অমান্য করেই যাও, তবে তোমাদের পরিণতি কি হবে, বিশেষতঃ যখন তোমাদের বনী-ইসরাঈলেরই কোন মান্যবর ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এটা আল্লাহর কিতাব, অতঃপর সে নিজেও মুসলমান হয়ে যায়? এ জ্ঞান লাভের পরও যদি তোমরা জেদ ও অহংকারে অটল থাক, তবে তোমরা গুরুর শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে।

আয়াতে বনী ইসরাঈলের কোন বিশেষ আলেমের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং এটাও নির্দিষ্ট করা হয়নি যে, এ সাক্ষ্য আয়াত অবতরণের পূর্বেই জনসমক্ষে এসে গেছে, না ভবিষ্যতে আসবে। তাই বনী ইসরাঈলের কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করার উপর আয়াতের অর্থ নির্ভরশীল নয়। খ্যাতনামা ইহুদী আলেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামসহ যত ইহুদী ও খ্রীষ্টান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন, তারা সবাই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যদিও আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে মদীনাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছিল।

হযরত সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, যাহ্যাক প্রমুখ তফসীরবিদগণ তাই বলেছেন। এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিগণী নয়। এমতাবস্থায় আয়াতটি ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে গণ্য হবে।—(ইবনে কাসীর)

وَكُلٌّ مِنْكُمْ نَفْسٌ مِّنْكُمْ وَكُلٌّ مِنْكُمْ نَفْسٌ مِّنْكُمْ

বিকৃত করে দেয়। অহংকারী ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিকেই ভালমন্দের মাপকাঠি বলে মনে করতে থাকে। সে যা পছন্দ করে না, অন্যেরা তা পছন্দ করলে সে সবাইকে বোকা মনে করে, অথচ বাস্তবে নিজেই বোকা। কাফেরদের এ ধরনের অহংকার ও গর্বই আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে। ইসলাম ও ঈমান তাদের পছন্দনীয় ছিল না। তাই অন্যান্য ঈমান-শ্রেমিকদের সম্পর্কে তারা বলত, ঈমান যদি ভালই হত, তবে সর্বগ্রে ত আমাদের পছন্দনীয় হত। এই হতচ্ছাড়াদের পছন্দের কি মূল্য।

ইবনে মুনির প্রমুখ এক রেওয়াজে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) যখন মুসলমান ছিলেন না, তখন তাঁর রানীন নাম্নী এক বাদী ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই অপরাধে তিনি বাদীকে প্রচুর মারধর করতেন, যাতে সে ইসলাম ত্যাগ করে। তখন কোরাইশ কাফেররা বলত, ইসলাম ভাল হলে রানীনের মত নীচ বাদী আমাদেরকে পেছনে ফেলে যেতে পারত না। এর পরিশ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(মায়হারী)

وَمَنْ قِيلَ لَهُ كُنْ مَوْسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً

এ আয়াত থেকে প্রথমতঃ প্রমাণ পাওয়া গেল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন অভিনব রসূল এবং কোরআন কোন অভিনব কিতাব নয় যে, এতে বিশ্বাস স্থাপনে আপত্তি হবে। বরং এর আগে মুসা (আঃ) রসূলরূপে আগমন করেছেন এবং তাঁর প্রতি তওরাত নাযিল হয়েছিল। ইহুদী ও খ্রীষ্টান কাফেররাও তা স্বীকার করে। দ্বিতীয়তঃ এতে وَشَهِدَ شَاهِدٌ বাক্যেরও সমর্থন আছে। কেননা, মুসা

(আঃ) ও তওরাত রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও কোরআনের সত্যতার সাক্ষ্যদাতা।

পূর্বাঙ্ক আয়াতসমূহে জ্বালেমদের জন্যে শাস্তিবাদী এবং মুমিনদের জন্যে সাক্ষ্যের সুসংবাদ ছিল। আলোচ্য ১৩ ও ১৪ নং আয়াত তারই পরিশিষ্ট। প্রথম অর্থাৎ, لَنْ أَدْرِيَنَّكَ اللَّهُ ثُمَّ نَسَّأْنَا آয়াতে অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ ভঙ্গিতে সমগ্র ইসলাম, ঈমান ও সংকর্মসমূহকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। اللَّهُ بাক্যে সমগ্র ঈমান এবং استقامة শব্দের মধ্যে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের অবিচল থাকা ও তদনুযায়ী পূর্ণমাত্রায় আমল করা দাখিল রয়েছে। استقامة এর গুরুর ব্যাখ্যা সূরা হা-মীম সেক্ষেত্রায় বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ঈমান ও ঈমানে অবিচল থাকার কারণে গুয়াদা করা হয়েছে যে, তাদের ভবিষ্যতে কোন দুঃখ কষ্টের ভয় নেই এবং অতীত কষ্টের কারণেও তারা পরিতাপ করবে না। পরের আয়াতে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তাদের এই সুখ চিরস্থান ও স্থায়ী হবে। পরবর্তী ১৫-১৮ নং আয়াতে মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এর বিপরীত কর্মের নিন্দা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মানুষের প্রতি পিতা-মাতার অনুগ্রহ সম্ভানের জন্যে শ্রম ও কষ্ট স্বীকার এবং পরিণত বয়সে পৌছার পর মানুষকে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার বিশেষ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। ইবনে কাসীরের ভাষায় পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এর সম্পর্ক ও যোগসূত্র এই যে, কোরআন পাক সাধারণভাবে যেখানে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদতের দিকে দাওয়াত দেয়, সেখানে সাথে সাথে পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্যবহার, তাদের সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের নির্দেশও দান করে। বিভিন্ন সূরার অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী এখানেও আল্লাহর তওহীদের প্রতি দাওয়াতের সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কুরতুবীতে বর্ণিত যোগসূত্র এই যে, এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এক প্রকার সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, আপনি ঈমান ও তওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখুন। কেউ কবুল করবে এবং কেউ করবে না। এতে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, মানুষ তাদের পিতা-মাতার ক্ষেত্রেও সবাই সমান নয়। কেউ পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করে এবং কেউ সদ্যবহার করে না।

মোটকথা, এ আয়াত চতুষ্টিয়ের আসল বিষয়বস্তু হল পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার শিক্ষা দেয়া। অবশ্য এতে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য শিক্ষাও এসে গেছে। কোন কোন রেওয়াজে থেকে জানা যায় যে, এসব আয়াত হযরত আবুবকর (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এর ভিত্তিতেই তফসীরে মায়হারীতে وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بাক্যে انسان এর অর্থ নেয়া হয়েছে, হযরত আবু বকর (রাঃ)। বলাবাস্লে কোরআনের কোন আয়াত অবতরণের কারণ কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা ঘটনা হলেও আয়াতের নির্দেশ সবার জন্যেই ব্যাপক হয়ে থাকে। এখানেও যদি আয়াতটির অবতরণের কারণ হযরত আবু বকর হয়ে থাকেন এবং আয়াতে উল্লেখিত বিশেষ গুণাবলী তাঁরই গুণাবলী হয়ে থাকে, তবুও আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে সবাইকে শিক্ষা দান করা। আসল আয়াতকে ব্যাপক রাখা হলে হযরত আবু বকর (রাঃ) আয়াতে বর্ণিত শিক্ষার প্রথম প্রতীক হবেন এবং যৌবনে পদার্পণ ও চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়া সম্পর্কিত বিশেষ গুণাবলী হবে দৃষ্টান্তস্বরূপ। এখন আয়াতসমূহের বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা দেখুনঃ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

নির্দেশ এবং احسان এর অর্থ সদ্যবহার। এতে সেবা-যত্ন, আনুগত্য,

সম্মান ও সম্প্রদায় প্রদর্শনও অন্তর্ভুক্ত।

حَمَلْتُهُ أُمَّهُ كَرَاهٍ - শব্দের অর্থ সে কষ্ট, যা

মানুষ কোন কারণবশতঃ সহ্য করে থাকে এবং কَرَاهٍ এর অর্থ সে কষ্ট, যা সহ্য করতে অন্য কেউ বাধ্য করে। এ থেকেই كَرَاهٍ শব্দের উৎপত্তি। এ বাক্যটি প্রথম বাক্যেরই তাকীদ। অর্থাৎ, পিতা-মাতার সেবা-যত্ন ও আনুগত্য জরুরী হওয়ার এক কারণ এই যে, তারা তোমাদের জন্যে অনেক কষ্টই সহ্য করেন। বিশেষতঃ মাতার কষ্ট অনেক বেশী হয়ে থাকে। তাই এখানে কেবল মাতার কষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মাতা দীর্ঘ নয় মাস তোমাদেরকে গর্ভে ধারণ করে। এ ছাড়াও এসময়ে তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। এরপর প্রসবকালে অসহনীয় প্রসব বেদনার পর তোমারা ভূমিষ্ঠ হও।

মাতার হক পিতা অপেক্ষা বেশী : আয়াতের শুরুতে পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ স্থলে কেবল মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট অপরিহার্য ও জরুরী। গর্ভধারণের সময়ে কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট সর্ববিস্তার ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাতাকেই সহ্য করতে হয়। পিতার জন্যে লালন-পালনের কষ্ট সহ্য করা সর্ববিস্তার জরুরী হয় না। পিতা ধনাঢ্য হলে এবং তার চাকর-বাকর থাকলে অপরের মাধ্যমে সন্তানের দেখাশুনা করতে পারে, কিংবা বিদেশে অবস্থান করে ভরণ-পোষণের অর্থ প্রেরণ করতে পারে। এ কারণেই রসুলুল্লাহ (সাঃ) সন্তানের উপর মাতার হক বেশী রেখেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন- **صل أمك ثم أمك ثم أبك** অর্থাৎ, মাতার সাথে সদ্যবহার কর, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর পিতার সাথে, অতঃপর নিকট আত্মীয়ের সাথে।

وَحَمَلْتُهُ وَفِطْلُهُ ثَلَاثِينَ شَهْرًا - এ বাক্যেও মাতার কষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও প্রসবের কষ্টের পরও মাতা রেহাই পায় না। এর পরে সন্তানের খাদ্যও আল্লাহ তাআলা মাতার স্তনে রেখে দিয়েছেন। মাতা তাকে স্তন্যদান করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্য ছাড়ানো ত্রিশ মাসে হয়। হযরত আলী (রাঃ) এই আয়াতদুটো বলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। কেননা, **وَالْوَالِدَاتُ**

يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ আয়াতে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল পূর্ণ দু' বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এখানে গর্ভধারণ ও স্তন্যদান উভয়ের সমকাল বর্ণিত হয়েছে ত্রিশ মাস। অতএব, স্তন্যদানের দু' বছর অর্থাৎ, চব্বিশ মাস বাদ দিলে গর্ভধারণের জন্যে ছয় মাসই অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং এটাই হবে গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল। রেওয়াজে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান গনী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে জনৈক মহিলার গর্ভ থেকে ছয় মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে গেলে তিনি একে অবৈধ গর্ভ সাব্যস্ত করে শাস্তির আদেশ জারী করেন। কেননা, সাধারণ নিয়ম ছিল নয় এবং সর্বনিম্ন সাত মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া। হযরত আলী (রাঃ) এই সংবাদ অবগত হয়ে খলীফাকে শাস্তি কার্যকর করতে বারণ করলেন এবং আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। খলীফা তার যুক্তিপ্রমাণ কবুল করে শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করে নেন।—(কুরত্বী)

এ কারণেই সমস্ত আলেমগণ একমত যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস হওয়া সম্ভবপর। এখন সর্বোচ্চ সময়কাল কি, এ

সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। তাব কোরআন এ সম্পর্কে কোন ফয়সালা দেয়নি।

আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস নির্ধারিত। এর কম সময়ে সন্তান সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। তবে সর্বোচ্চ কতদিন সন্তান গর্ভে থাকতে পারে, এ সম্পর্কে অভ্যাস বিভিন্মরূপ। এমনভাবে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল দু' বছর নির্ধারিত। বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে আরও ছয়মাস সময় বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু সর্বনিম্ন সময়কাল নির্দিষ্ট নেই। কোন কোন নারীর দুধই হয় না এবং কারণও কারণও দুধ কয়েক মাসেই শুকিয়ে যায়। কতক শিশু মায়ের দুধ পান করে না অথবা মায়ের দুধ শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়। ফলে অন্য দুধ পান করাতে হয়।

حَتَّىٰ تَأْتِيَنَّكَ أَسَدًا وَبِكْرًا رَّيَيْنِ سَنَةً - এর শাব্দিক অর্থ

শক্তি সামর্থ্য। সূরা আনআমে এর তফসীর করা হয়েছে 'প্রাপ্তবয়স' বলে।

وَبِكْرًا رَّيَيْنِ سَنَةً - অতঃপর

কে বয়সের অপর একটি স্তর সাব্যস্ত করেছেন। হাসান বসরীর মতে

وَبِكْرًا رَّيَيْنِ سَنَةً - উভয়টি সমার্থবোধক। আয়াতে প্রথমে

সন্তানের গর্ভধারণ, অতঃপর স্তন্যপানের সময়কাল বর্ণনা করার পর

حَتَّىٰ تَأْتِيَنَّكَ - বলার অর্থ এই যে, এরপর সে প্রাপ্তবয়স্ক ও শক্তিশালী

হল এবং জ্ঞানবুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করল। এ সময় সে সৃষ্টি ও পালনকর্তার

অভিমুখী হওয়ার তওফীক লাভ করল। ফলে এই বলে দোয়া করতে

লাগল **رَبِّ أَوْ عَوْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ**

وَالدَّيْنِ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دِينِي وَمَا رَزَقْتَنِي مِنْ

الْيَمِينِ وَالْأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে

শক্তি দিন, যাতে আমি আপনার নেয়ামতের শোকর আদায় করি, যা

আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি

আপনার পছন্দনীয় সংকর্ম করি, আমার পিতা-মাতাকেও সংকর্ম পরায়ণ

করুন। আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আমি আপনার একজন

আজ্ঞাবহ। এখানে সবগুলো ক্রিমার অতীত পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ

থেকে ব্যহতঃ বোঝা যায় যে, এটা কোন বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ ব্যক্তির

বর্ণনা, যা আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়ে থাকবে। একারণেই

তফসীরে মাযহরীতে বলা হয়েছে যে, এগুলো সব হযরত আবু বকর

(রাঃ)-এর অবস্থা। এগুলোই ব্যাপক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে

অন্য মুসলমানগণও এতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং এরূপ করে। কুরত্বীতে বর্ণিত

হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়াজেতের দলীল। সে রেওয়াজেতে বলা

হয়েছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন বিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজার অর্ধকড়ি

দিয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া সফরে যান, তখন হযরত আবুবকর সে

সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল আঠার বছর। এ

বয়সকেই **بِكْرًا رَّيَيْنِ** বলা হয়েছে। এ সফরে তিনি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর

অসাধারণ অবস্থা অবলোকন করে তার একান্ত ভক্ত হয়ে যান। সফর

থেকে ফিরে এসে তিনি অধিকাংশ সময় রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহচর্যে

অতিবাহিত করতেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ

হলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুওয়ত দান করলেন। তখন আবু বকর

(রাঃ)-এর বয়স ছিল আটত্রিশ বছর। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই

الاحقاف ۳

৫-৫

ছন্দ

أُولَئِكَ الَّذِينَ تَقْبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَعَالٍ وَأَنْتُمْ عَنْ سِيَئِهِمْ  
 فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي  
 قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَقْبِلَا مَا لَكُمَا أُعْتِدَ لِيَوْمِ أَنْخَبْتُ مِنَ الْقُرُونِ  
 مِنْ قَبْلِ ۖ وَهُمَا يُسْتَعِذْنَ بِاللَّهِ مِنْكَ إِنْ رَأَى وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا  
 قَوْلَهُ مَاهَذَا إِلَّا أَصَابِيرُ الَّذِينَ ۖ أُولَئِكَ الَّذِينَ عَسَىٰ عَلَيْهِمُ  
 الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ أَنْهُمْ  
 كَانُوا خَيْرِينَ ۖ وَلَئِنْ دَرَجْتَ مَا وَعَاوَرُوا لِيَوْمِهِمْ أَهْلَهُمْ  
 وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ۖ وَيَوْمَ نَعْرُضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ  
 أَذْهَبْتُمْ طِبْيَئَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۖ وَالْيَوْمَ  
 نَجْزِي عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي  
 الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ۖ وَإِذْ ذُكِّرْنَا  
 عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّجُومُ  
 بِئْسَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلَقَهُ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنْ كُنَّا  
 عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۖ قَالُوا الْحَسْبُنَا مَا فِي كِتَابِنَا  
 عَنِ الْهَوْتَمَاءِ ۖ فَأَتَيْنَاهُمَا نِعْدَانِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۖ

(১৬) আমি এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি এবং মন্দকর্মগুলো মার্জন করি। তারা জন্মাতীনের তালিকাভুক্ত সেই সত্য ওয়াদার কারণে যা তাদেরকে দেওয়া হয়। (১৭) আর যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বলে, ঠিক তোমাদেরকে, তোমরা কি আমাকে খবর দাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব, অথচ আমার পূর্বে বহু লোক গত হয়ে গেছে? আর পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভাগ তোমার তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তখন সে বলে, এটা তো পূর্বতীদের উপকথা বৈ নয়। (১৮) তাদের পূর্বে যে সব জিন ও মানুষ গত হয়েছে, তাদের মধ্যে এ ধরনের লোকদের প্রতিও শাস্তিবাদী অবধারিত হয়ে গেছে। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। (১৯) প্রত্যেকের জন্যে তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর রয়েছে, যাতে আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেন। বস্তুতঃ তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (২০) যেদিন কাফেদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে, তোমরা তোমাদের সুখ পার্শ্ববর্তীনেই নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানকর আযাবের শাস্তি দেয়া হবে; কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে এবং তোমরা পাপাচার করত। (২১) আঁ দ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা স্মরণ করুন, তার পূর্বে ও পরে অনেক সতর্ককারী গত হয়েছিল, সে তার সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় এ মর্মে সতর্ক করেছিল যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও এবাদত করো না। আমি তোমাদের জন্যে এক মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি। (২২) তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য দেব-দেবী থেকে নিবৃত্ত করতে আগমন করেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দাও, তা নিয়ে আস।

ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর হয়ে গেল, তখন তিনি উল্লেখিত দোয়া করলেন। আয়াতে **وَلَمْ نَكُنْ مِنْهَا لَكُمْ نَصِيحَةً** বলে তাই বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর **وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ** দোয়াও কবুল করেন এবং নয় জন মুসলমান ও কাফেরদের হাতে নির্যাতিত গোলাম ক্রয় করে, মুক্ত করার তওফীক দান করেন। এমনভাবে তাঁর দোয়া **وَأَصْبِرْ لِي ذُرِّيَّتِي** কবুল হয়। বস্তুতঃ তাঁর সন্তানদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে ইসলাম গ্রহণ করেননি। আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবু বকরকেই এই বৈশিষ্ট্য দান করেন যে, তিনি নিজেও মুসলমান হন এবং পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তাঁরা সবাই রসূল করীম (সাঃ)-এর পবিত্র সংসর্গও লাভ করেন। তফসীরে রুহুল মাআনীতেও একথা বর্ণিত রয়েছে। এখন প্রশ্ন হয় যে, তাঁর পিতা আবু কুহাফা মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হয়েছিলেন, আর এ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই তখন পিতা-মাতার প্রতি নেয়ামত দেয়ার কথা কেমন করে উল্লেখ করা হল? জওয়াব এই যে, কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। এরূপ হলে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না। আর যদি মক্কায় অবতীর্ণ হয়, তবে অর্থ হবে ইসলামের নেয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত হওয়ার দোয়া। (রুহুল মাআনী) এই তফসীর দৃষ্টে যদিও সবগুলো অবস্থা হযরত আবু বকরের বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু আয়াতের বিধান সবার জন্যেই প্রযোজ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য সমস্ত মুসলমানকে নির্দেশ দেয়া যে, মানুষের বয়স চল্লিশ বছরের নিকটবর্তী হয়ে গেলে তার মধ্যে পরকাল চিন্তা প্রবল হওয়া উচিত। অতীত গোনাহ থেকে তওবা করে ভবিষ্যতে সেগুলো থেকে আত্মরক্ষায় পুরোপুরি যত্নবান হওয়া দরকার। কেননা, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, চল্লিশ বছর বয়সে যে অভ্যাস ও চরিত্র গড়ে উঠে, তা পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে থাকে।

হযরত ওসমান (রাঃ)-বর্ণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ-সাঃ বলেন, মুমিন বান্দা যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা হিসাব সহজ করে দেন, যাট বছর বয়সে পৌছালে সে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার তওফীক লাভ করে, সত্তর বছর বয়সে পৌছালে আকাশের অধিবাসীরা তাকে ভালবাসতে শুরু করে, আশি বছর বয়সে পৌছালে আল্লাহ তাআলা তার সংকর্মসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং মন্দ কর্মগুলোকে মিটিয়ে দেন এবং যখন সে নব্বই বছর বয়সে পৌছে, তখন আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত অতীত গোনাহ মার্জ করে দেন, তাকে তার পরিবারের লোকজনের জন্যে সুপারিশ করার অধিকার দেন এবং আকাশে তার নামের সাথে **أسير الله في الارض** লিখে দেন। অর্থাৎ, সে পৃথিবীতে আল্লাহ কয়েদী।—(ইবনে কাসীর) বলাবাহুল্য, হাদীসে সে মুমিন বন্দাকে বোঝানো হয়েছে, যে শরীয়তের বিধি-বিধানের অনুসারী হয়ে খোদাতীতি সহকারে জীবন অতিবাহিত করে।

#### আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أُولَئِكَ الَّذِينَ تَقْبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَعَالٍ وَأَنْتُمْ عَنْ سِيَئِهِمْ

অর্থাৎ, উপরোক্ত গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এটাও ব্যাপক বিধান। তবে হযরত আবু বকরের ক্ষেত্রে এটা সর্বপ্রথম প্রযোজ্য। হযরত আলী (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত উক্তি থেকেও আয়াতের ব্যাপকতা বোঝা যায়। মুহাম্মদ ইবনে হাতেম বর্ণনা করেন, একবার আমি আমীরুল মুমেনীন

হযরত আলীর (রাঃ) নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে আরও কিছু লোক উপস্থিত ছিল। তারা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর চরিত্রে কিছু দোষ আরোপ করলে তিনি বললেন :

كان عثمان رضى الله عنه من الذين قال الله تعالى فيهم :

أُولَئِكَ الَّذِينَ تَتَّقِي لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آسَاءُ مَا عَزَبُوا وَتَتَّعَاوَنَ عَلَىٰ سَيِّئِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْحَيْكَةِ وَعَدَّ الَّذِينَ كَانُوا يُوعَدُونَ

قال والله عثمان واصحاب عثمان رضى الله عنهم قالها ثلاثا .

অর্থাৎ, হযরত ওসমান (রাঃ) সে লোকদের অন্যতম ছিলেন, যাঁদের কথা আল্লাহ্ তাআলা **أُولَئِكَ الَّذِينَ تَتَّقِي** আয়াতে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্‌র কসম! ওসমান ও তাঁর সঙ্গীদের ক্ষেত্রেই এই আয়াত প্রযোজ্য। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন।—(ইবনে কাসীর)

পূর্বের আয়াতসমূহে মাতা-পিতার সেবায় ও আনুগত্য সম্পর্কিত নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছিল। এ আয়াতে সে ব্যক্তির আযাব ও শাস্তি উল্লেখিত হয়েছে, যে পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার ও কটুক্তি করে। বিশেষতঃ পিতা-মাতা যখন তাকে ইসলাম ও সংকর্মের দিকে দাওয়াত দেয়, তখন তাদের কথা অমান্য করা দ্বিগুণ পাপ। ইবনে কাসীর বলেন, যে কোন লোক পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করবে, তার ক্ষেত্রেই এ আয়াত প্রযোজ্য হবে।

মারওয়ান এক ভাষণে বলেছিল, এ আয়াত হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সহীহ বুখারীর রেওয়াজে আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) মারওয়ানের এই দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। কোন সহীহ রেওয়াজে আয়াতটি কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে

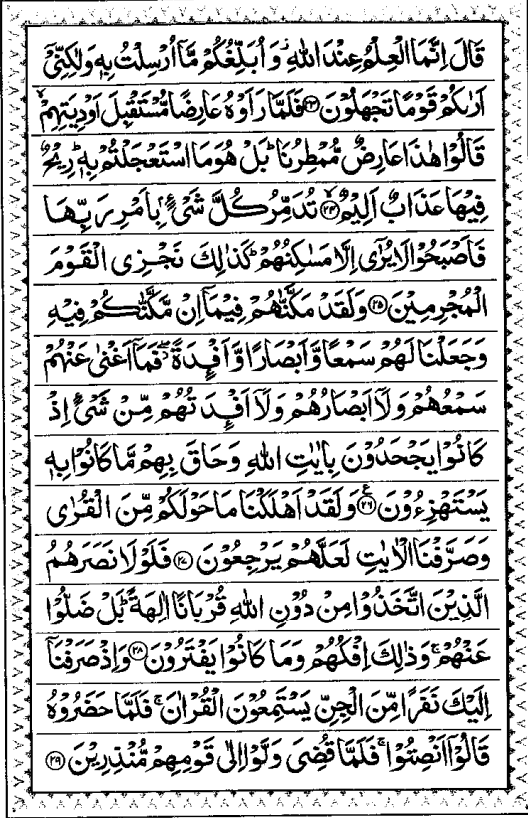
বর্ণিত নেই।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ

أَذْهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا

অর্থাৎ, কাফেরদেরকে বলা হবে, তোমরা কিছু ভাল কাজ দুনিয়াতে করে থাকলে তার প্রতিদানও তোমাদেরকে পার্থিব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের আকারে দেয়া হয়েছে। এখন পরকালে তোমাদের কোন প্রাপ্য নেই। এ থেকে জানা যায় যে, কাফেরদের যেসব সংকাজ ঈমানের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় নয়; পরকালে সেগুলো মূল্যহীন; কিন্তু দুনিয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সেগুলোর প্রতিদান দিয়ে দেন! কাজেই কাফেররা দুনিয়াতে যেসব বিষয়-বৈভব, ধন-দৌলত, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি লাভ করে, সেগুলো তাদের দানশীলতা, সহানুভূতি, সততা ইত্যাদি সংকর্মের প্রতিফল হয়ে থাকে। মুমিনদের জন্যে এরূপ নয়। তারা দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি নেয়ামত লাভ করলেও পরকালের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে না।

দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা : আলোচ্য আয়াতে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকার কারণে কাফেরদের উদ্দেশে শাস্তিবাদী উচ্চারিত হয়েছে। তাই রসুলুল্লাহ্ (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বর্জন করার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের জীবনালেখ্য এর সাক্ষ্য দেয়। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)-কে ইয়ামন প্রেরণ করার সময় এ উপদেশ দেন : দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থেকে। হযরত আলীর রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অল্প রিযিক নিতে সম্মত হয়ে যায়, আল্লাহ্ তাআলাও তার অল্প আমলে সন্তুষ্ট হয়ে যান।—(মাযহারী)



(২৩) সে বলল, এ জ্ঞান তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আমি যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছি, তা তোমাদের কাছে পৌঁছাই। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মুর্খ সম্প্রদায়। (২৪) (অতঃপর) তারা যখন শান্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল, তখন বলল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। বরং এটা সেই বস্তু, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা বায়ু এতে রয়েছে মর্মস্তদ শান্তি। (২৫) তার পালনকর্তার আদেশে সেসব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে। অতঃপর তারা ভোর বেলায় এমন হয়ে গেল যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনিভাবে শান্তি দিয়ে থাকি। (২৬) আমি তাদেরকে এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যে বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দেইনি। আমি তাদের দিয়েছিলাম, কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়, কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসল না, যখন তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করল এবং তাদেরকে সেই শান্তি গ্রাস করে নিল, যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিজ্ঞপ করত। (২৭) আমি তোমাদের আশপাশের জনপদসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছি এবং বার বার আয়াতসমূহ শুনিয়েছি, যাতে তারা ফিরে আসে। (২৮) অতঃপর আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে সান্নিধ্য লাভের জন্যে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা ছিল তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়। (২৯) যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিল। তারা যখন কোরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন পরস্পর বলল, চূপ থাক। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল।

### আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতসমূহের ষোড়শ সূত্র : উপরে 'আদ সম্প্রদায়ের কাহিনী বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছিল। এখন তাদেরই মত অন্যান্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যাদেরকে কুফর ও পয়গমুরগণের বিরোধিতার কারণে বিভিন্ন আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছিল। তাদের জনপদের ধ্বংসাবশেষ মক্কাবাসীদের সফরের পথে অবস্থিত ছিল। এসব ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে সংক্ষেপে তাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।)

আমি তোমাদের আশপাশের আরও জনপদ (কুফর ও শিরকের কারণে) ধ্বংস করে দিয়েছি। (যেমন, সামুদ ও লুতের সম্প্রদায়। মক্কাবাসীরা সিরিয়া সফরে এসব জনপদ অতিক্রম করত। মক্কার এক দিকে ইয়ামন ও অপরদিকে সিরিয়া অবস্থিত ছিল। তাই 'مَا حَوْلَكُمْ' বলা হয়েছে।) এবং আমি (ধ্বংস করার পূর্বে তাদের উপদেশের জন্যে) বার বার নির্দর্শনসমূহ দেখিয়েছি, যাতে তারা (কুফর ও শিরক থেকে) বিরত হয়। (কিন্তু তারা বিরত হল না এবং ধ্বংস হয়ে গেল।) অতঃপর আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে নৈকট্য লাভের জন্যে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল (ধ্বংস ও আযাবের সময়) তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা (অর্থাৎ, তাদেরকে উপাস্য ও সুপারিশকারী মনে করা) ছিল তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়। (বাস্তবে তারা উপাস্য ছিল না।)

মক্কার কাফেরদেরকে শোনানোর জন্যে পূর্বেকার আয়াতসমূহে কুফর ও অহংকারের নিন্দা ও ধ্বংসকারিতা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে লজ্জা দেয়ার উদ্দেশ্যে জিনদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, জিনরা অহংকার ও গর্বে তোমাদের চেয়েও বেশী, কিন্তু কোরআন শুনে তাদের অস্তরও বিগলিত হয়ে গেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা জিনদের চেয়ে বেশী জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন; কিন্তু তোমরা ইসলাম গ্রহণ করছ না। (জিনদের কোরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সহীহ হাদীসসমূহে এভাবে বর্ণিত হয়েছে -

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পর থেকে জিন জাতিকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহ থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়। সেমতে তাদের কেউ সংবাদ শোনার মানসে উপরে গেলে তাকে উচ্চাপিণ্ড নিক্ষেপ করে বিতাড়িত করা হত। জিনরা এই নতুন পরিস্থিতির কারণ উদঘাটনে সচেষ্ট হল এবং তাদের বিভিন্ন দল কারণ অনুসন্ধান পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল। একদল হেজাজেও পৌঁছল। সেদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) কয়েকজন সাহাবীসহ 'বাতনে নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর 'ওকায' বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। আরবরা আমাদের যুগের প্রদর্শনীর মত বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ বিশেষ দিনে মেলার আয়োজন করত। এসব মেলায় বহুলোক উপস্থিত থাকত, দোকান খোলা হত এবং সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হত। ওকায নামক স্থানে প্রতি বছর এমনি ধরনের এক মেলা বসত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্ভবতঃ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করছিলেন। নাখলা নামক স্থানে তিনি যখন ফজরের নামাযের কোরআন পাঠ করছিলেন, তখন জিনদের অনুসন্ধানী দলটি সেখানে গিয়ে পৌঁছল। তারা কোরআন পাঠ শুনে বলতে লাগল, এই সে নতুন ঘটনা, যার কারণে আমাদেরকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহে নিবৃত্ত করা হয়েছে।—(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

অন্য এক রেওয়াজেতে আছে যে, জিনরা সেখানে পৌঁছে পরস্পর